Eighth Convocation held on May 24, 1974

অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত*

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। কয়েক বৎসর পূর্বে এই উৎসবে আপনারা একজন সুপরিচিত কথাশিল্পীকে আহ্বান করে এনেছিলেন। তাঁর অভিভাষণে তিনি একটি দ্বিধার ভাব প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁদের মত লোক অর্থাৎ যাঁরা প্রচলিত অর্থে শিক্ষাব্রতী নন, সাধারণতঃ এসব সভায় তাঁদের সম্মানের পদে আহ্বান করা হয় না। আমিও যে সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হৃদয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায় আমার সমস্ত জীবন কেটেছে। তাহলেও সম্মানের আসন পেতে পারি এমন কোন অধিকার বীণাপাণি আমাকে দেন নি। কিন্তু আপনাদের আহ্বান আমার কাছে একটি বিশেষ অর্থ বহন করে এনেছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। আমার বালককালের অনেক সময় উত্তরবঙ্গের একটি শহরে কেটেছে। আপনাদের আমন্ত্রণ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে বহু বাল্য স্মৃতি জাগ্রত হল। যে শহরে আমি ছিলাম, সেখানে বৎসরের এই সময়, মেঘের ছায়ায় ম্লান অপরাহ্নের সূর্যালোক, বাগানের আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের উপরে আসন্ন বর্ষার আনন্দ মেঘ, ইঁদারার মিষ্টি ঠান্ডা জল এবং বাড়ীর একটি ছোট ঘরে পুরানো ও নতুন গ্রন্থ সংগ্রহ এর মধ্যে আমার বাল্যকালের অনেক সময় কেটেছে। এই খানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। রাজর্ষি উপন্যাসে শ্রাবণের রাত্রের ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের বর্ণনা এবং সম্রাটপুত্র সুজার নিদারুণ পরিণামের দিকে দুর্ণিমার আকর্ষণের কাহিনী একটি বালকের মনে অপরূপ মায়ার সৃষ্টি আমার মনে উজ্জীবিত হল।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন থেকে আজ চল্লিশ বৎসরের বেশী ব্যবধান। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি বিচ্যুতির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম। এখনমার ছাত্রসমাজ অবশ্য অনেক বেশী সচেতন। সমাজের চেহারাও চারিদিক থেকে বদলে গিয়েছে। আগে যে আচরণ বিস্ময় উদ্রেক করত আজ অনেক সময় আমরা তা লক্ষ্য করবার বিষয় বলে মনে করি না। পঁচিশ বৎসর পূর্বে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় অন্য রাজ্যের কজন বিশিষ্ট নাগরিক বলেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যতই সমালোচনা করা হোক, সব সময় সে সব নিন্দার কোন বিশেষ যুক্তি থাকে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় আর যাই হোক অনেক সরকারী দপ্তরের চেয়ে ভালভাবে পরিচালিত হয়। যিনি একথা বলেছেন তিনি উত্তর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই কথা যিনিই বলে থাকুন একথা মানতেই হবে যে এটাকে খুব উচ্চ প্রশংসা বলা

* উপাচার্য, বিশ্বভারতী

চলে না। এটা ব্যাজস্তুতি। একথা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের অনেকের মনের ভাব অনুকূল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে আশা আমরা করেছিলাম, সে কি পূর্ণ হয়েছে? ভারতবর্ষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স একশো বছরের কিছু বেশী। অন্য কয়েকটিও বেশ প্রাচীন। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব পর্যন্ত অনেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশবাসীর আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক ছিল। এই ধারণার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। আমরা অনেকদিন থেকে শুনে এসেছি ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিদেশী চক্রান্তের ফল এবং সরকারী প্রয়োজনে কিছু ইংরেজী শিক্ষার জানা গোমস্তার দরকার, এই কারণেই বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার উৎপত্তি। একটি সম্পূর্ণ বিদেশী কাঠামো আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ক্রমাগত পুনরাবৃত্তির ফলে একথা আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিদেশী সরকারের স্নেহচ্ছায়া নিশ্চয়ই ছিল। প্রথমযুগে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সেই যুগের বহু উৎসাহী দেশবাসী এবং কয়েকজন বিদেশীও ছিলেন। সরকারী পক্ষে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন তাও নয়। তাঁদের আপত্তি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়তো আরো কয়েক বছর আগেই সম্ভব হত। অন্ততঃ একজন বিদেশী এমন মত প্রকাশ করেছিলেন যে ইংরেজী ভাষা প্রচারের চেষ্টার ফলে সেই ভাষার প্রচার যথেষ্ট হবে কিনা ঠিক নেই। কিন্তু বাঙ্গালীরা অনেকে বাংলা ভাষার চর্চায় অবহেলা করবে। সেটা দেশের পক্ষে শুভ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরে যে ধরণের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছিল তাতে বিদেশী মিশনারীরা অনেকে খুশি হন নি। 'সত্য ধর্মে'র আলোক থেকে ভারতবাসীরা বঞ্চিত হবে একথা তাঁদের ভাল লাগে নি।

১৮৩৫ সালে মেকলের উক্তির সঙ্গে সকলের পরিচয় আছে। সরকারের উদ্দেশ্য হবে দেশে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার। কয়েক বছর পরে সরকারী নীতি ছিল যাঁরা ইংরেজী শিখবেন সরকারী চাকুরীতে তাঁদেরই নিয়োগ করা। যাকে সে যুগে ভার্ণাকুলার স্কুল বলা হত তার অদৃষ্টলিপি তখনই স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল। তাদের অবস্থা শীর্ণ ও ছাত্রাভাবে মৃতপ্রায়। ১৮৪৬ সালে নাটোরের কাছে এক গ্রামের অধিবাসীরা সরকারের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁদের 'ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়টির' পরিবর্তে একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হোক। ১৮৫৭ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল তখন তার ছাঁচ সম্পূর্ণ বিলেতী। তার আদর্শ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। এই কাঠামোটিকে তাঁরা এদেশের উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মিল দেখা যেত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও ভেবে দেখেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ অনেক বেশী পড়বে এবং ভারতবর্ষের জলহাওয়ার সঙ্গে এ দুটির পরিচালনা

পদ্ধতি খাপ খাবে না। শুনলে একটু অদ্ভুত লাগবে ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তাঁরা বিবেচনার অনুপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের মতে সরবোনের উচ্চ শিক্ষার মান নীচু, কলকাতার কলেজগুলির মানের সমকক্ষ নয়।

এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরো দুটি বোম্বাই ও মাদ্রাজ যা প্রায় একসঙ্গে জন্মলাভ করেছিল তা বহুদিন ধরে ভারতবর্ষের জ্ঞানের পিপাসাকে তৃপ্তি দান করছে। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে, দেশের যে মানসিক উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তারই প্রধান কারণ বলে মনে হত। স্বদেশী আমলের প্রথম থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। তার ছাঁচ বিজাতীয়, তার শিক্ষার বাহন বিদেশী, যেসব বিষয়ে চর্চা সেখানে হয় তার সবগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের আত্মার যোগ নেই এবং যেসব বিষয় আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পঠনীয় সেসব বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। কিন্তু যতই ক্ষোভ প্রকাশ করেছি এই ব্যবস্থা তেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি নি। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে আমরা জাতীয় বিদ্যালয় বা জাতীয় শিক্ষাপীঠ গড়বার চেষ্টা করেছি। এই সবের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। শিক্ষকরাও অনেকে এই কাজকে সাধারণ কর্ম নয়, ব্রত বলেই গ্রহণ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলকাতায় জাতীয় বিদ্যাপীঠের কথা কারুর মনে থাকতে পারে। বিদ্যাপীঠের আয়ু বেশীদিন ছিল না, আয়োজনও ছিল স্বল্প। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রদের মধ্যে বঙ্গ দেশের খ্যাতিমান পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়োজন অপ্রচুর কিন্তু উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সে ত্রুটি দূর হয়ে যাবে এ আশা আমরা পোষণ করেছিলাম। আশা মিলিয়ে যেতে বিলম্ব হয় নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার সময় তার প্রথম উপাচার্য সার জেমস্ কল্‌ভিল্ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও প্রসার হতে বিলম্ব হবে। পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত বিস্তার কিভাবে হবে সেকথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। আজ একশ বছরের কিছু পরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংখ্যা অন্ততঃ একশো হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত এমন বিশ্ববিদ্যালয় নেই বললেই হয়। এর অনেক কারণ আছে। এর একটা বড় কারণ অবশ্য রাজনৈতিক। মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী বিদ্রোহী প্রজাদের সম্বন্ধে বলেছিল ঃ 'এদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি।' আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বহুদিন তেকে রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁদের সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

যাঁরা বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে সব ত্রুটি ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ

ছাত্র তাঁরা পৃথিবীর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদন্ডেও শ্রেষ্ঠ ছাত্র। আমরা যখন অধ্যাপনা করি তখন এইসব ছাত্রদের কথা মনে করেই উৎসাহ পাই। আমাদের দেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক কিম্বা গবেষক তাঁরা অন্য দেশেও শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক কিম্বা গবেষক বলে স্বীকৃত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সর্বত্রই তাঁরা সংখ্যায় কম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির একটি কারণ ছাত্রাবাসের অব্যবস্থা। এত বেশী সংখ্যক ছাত্রকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই প্রকৃত যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। ছাত্রছাত্রীরাও কখনও কখনও একন বিষয় পড়তে বাধ্য হয় যাতে তাদের স্বাভাবিক অনুরাগ নেই। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রুচি ভিন্ন হতে বাধ্য। উপার্জনের কোনো পথ খোলা থাকলে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের তলায় আসতে চাইতেন না। অন্য পথ খোলা থাকলে তাঁদের পক্ষে সেদিকে কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হত। আমাদের মত অসহায়। পরিত্রাণের পথ তার হাতে নেই। তার কাজ দেশের তরুণ ও যুবকদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং যে জীবনে তারা পরবর্তীকালে প্রবেশ করবে তার উপযোগী করে তোলা। জীবনযুদ্ধে যখন পরাজয়কে আসন্ন মনে করি তখন আমরা নিষ্ফল আক্রোশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দায়ী মনে করে সান্তনা লাভ করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বলি — মাতৃস্থানীয়া। আমাদের আচরণ অবশ্য সবসময় পুত্রবৎ হয় না। আমরা অনেক সময় তাকে স্নহহীন, মমতাহীন, নিষ্ঠুর বিমাতা বলে মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠা এই সব কারণে সম্ভব হয় না। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন মন্তব্য করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বা অনয হিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাসের যথেষ্ট যত্ন নেওয়া কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। কয়েক বছরের জন্য ছাত্রাবাসই তার গৃহ। তার ব্যক্তি গত জীবনের আশ্রয় তার মনের আরাম — তার লেখাপড়া করবার, বিশ্রাম করবার কিম্বা স্নানাহারের জায়গা মাত্র নয়। একে অবলম্বন করে কয়েক বৎসরে তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে। বিদেশে কোনও কোনও ছাত্রাবাস দেখবার সময় এ কথা আমার মনে হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের পরে আজ পঁচিশ বছর পার হয়ে এসেছি। দেশেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারেও প্রকৃতপসক্ষ গৃহ বলতে বিশেস কিছু বোঝায় না। আমি আজ ছাত্র হলে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের কথার তাৎপর্য হযত ভাল করে বুঝতে পারতাম না। যে জিনিষ আমি কখনো দেখি নি তার ছায়া আমি কি করে অন্যত্র আরোপ করাব?

ছাত্রদের সম্বন্ধে বলেছি যে তাদের সকলের শেষ ধাপ পর্যন্ত যাবার দরকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বেড়া অতিক্রম করার পরে তাকে জীবনধারণের উপায় বলে যে সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়ে দেওয়া হয় সে পথ তাদের জন্য পূর্বেই চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই ভাবনা রাষ্ট্রনায়কদের। আমাদের দেশ গরীব দেশ — এ কথা লজ্জা ও দুশ্চিন্তার বিষয়।

চল্লিশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম ছিল। ভাল ছাত্র যাঁরা অধ্যাপনা করতে আসতেন, তাঁরা অনেক সময় অন্য পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বলেই আসতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্য থেকে আমরা ভাল অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক পেয়েছি। তাঁরা অবশ্য সংখ্যায় অল্প, ভাল ছাত্রদের মতন। বাংলা সাহিত্যে এই রকম অধ্যপক অথবা বিজ্ঞানীদের ছবি ছড়ান আছে। অবশ্য এর উল্টো জিনিষও পাওয়া যায়, তাঁরাই সংখ্যায় বেশী। এ কথা সত্য যে প্রাচীন অধ্যপকরা সবাই যে যথেষ্ট গুণসম্পন্ন, খ্যাতিসম্পন্ন ও বিবেকবান ছিলেন তা নয়, কিন্তু তখন প্রতিবাদ করার কথা মনে হত না। এখন হয়ত অধ্যপকদের কাছ থেকে অনেক বেশী দাবী করি। যে মাপকাঠিতে বিদেশী পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের বিচার করে দেখি আগে সে মাপকাঠির কথা আমরা ভাবতাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দ্বারা যে গবেষণা হওয়া সম্ভব সেদিকে আমরা এখনও যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করিনি। এর জন্য এখন আর অর্থাভাবকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দেওয়া অবহয কর্তব্য, কিন্তু গবেষণার দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত না রাখলে অধ্যাপনার মান রক্ষা করা যায় না। পূর্বে দেখা গিয়েছে যে কোনও কোনও অধ্যাপকতাঁর ছাত্রবসের বিবর্ণ খাতা প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত ক্লাসে ব্যবহার করেছেন এবং তার অনুলিপি নেওয়া ছাড়া কোন গতি থাকত না। আশা করি এই রীতি সহজ উপায়ে পাঠ দেবার প্রবৃত্তি এখন দূর হয়েছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে বাইরের গোলযোগ যতই প্রবল হোক যে অধ্যাপক নিজের কাজে অবিচলিতথাকেন নিজের ছাত্রদের কাছে তাঁর গৌরবের আসন স্থায়ী হতে বাধ্য। আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় তেকে তার একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তার কয়েকটি কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমরা অনেক সময় সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ করি। কাজ আরম্ভ করেছি, শুধু এ কথা বলায় কোন গৌরব নেই, যদি তার যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকে। গবেষণাগার সম্পূর্ণ হয় নি। গ্রন্থাগারের পুস্তক - সংগ্রহ যথেষ্ট নয়। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের থাকবার স্থান কিম্বা চিত্তবিনোদনের কোনো ব্যবস্তা নেই। সে সময় একটি চাপা অসন্তোষ, কোনো কোনো শিক্ষায়তনের এই চিত্র। এই হচ্ছে ব্যাধির একটি কারণ। আমাদের দেশে বিশ্ব বিদ্যালয় ভবনগুলি দ্রুত প্রসারিত করবার বাধা হতে পারে, যে ধরণের অধ্যাপককে প্রয়োজন তাঁকে ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। একবার আরম্ভ করে দিলে অন্য সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে এই অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করবার সময় এসেছে।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ ইচ্ছা আমি বহন করে এনেছি তার সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সাদৃশ্য আছে। যে মহাপুরুষের নামের সঙ্গে এই স্থানের নাম বিজড়িত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা তাঁকে ভারতপথিক বলে একাধিকবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বিশ্বভারতীর আশ্রম অঞ্চলে এবং চারিদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্দ্ধমান পাঠগৃহ, ছাত্র - ছাত্রীনিবাস ও গ্রন্থাগার বিস্তৃত

হওয়ার ফলে চল্লিশ বছর আগেকার শান্তি নিকেতন আর নেই। কালের নিয়মে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাহলেও বলব এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এমন শ্রী আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অল্পই আছে। কয়েকে বৎসর পূর্বে আমার যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার সুযোগ হয়েছিল তখনও আমার এই কথা মনে হয়েছিল। প্রভেদ এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এবং তার চারিদিকে এখনও মানুষের হাতের চিহ্ন যথেষ্ট পড়েনি। শালবন, যেখানে আপনাদের অনেক উৎসব হয়েছে সেখান থেকে নগাধিরাজের পাদদেশ পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশ এবং মেঘের খেলা। বিশ্ববিদ্যালয় যতই বিস্তৃত হোক এই দৃশ্য কখনও লুপ্ত হবে না।

এতক্ষন যে কথা আপনাদের বলেছি তা অতিথির আসন থেকে নয়, একজন বর্ষীয়ান ছাত্র কিভাবে তার নিজের জীবনকে দেখেচে তার সামান্য পরিচয়, তার অনুজদের কাছে। সমাবর্তন উপলক্ষে প্রথা স্নাতকদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানানো। আমি আশা করব যে এই বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের তীক্ষ্ণতা এবং হৃদয় ও মনের প্রসারতা, শক্তি ও বিনম্রতা দান করুক। আত্মার দীনতা থেকে আপনাদের মুক্ত করুক। রাষ্ট্রনায়কদের হাত থেকে সমস্ত সমাধান খুঁজে পাবেন এ আশা করবেন না। এ আশা সম্ভব হতে পারে না। বিদেশী শাসনের সময় আমরা অনেক কাজ নিজের তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিদেশী শাসকদের উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল না। কিন্তু আজ নিজেদের সরকার বলেই সব সমস্যা তাঁদের হাতে তুলে দিলে সহজে সমাধান হবে এই মূঢ়তা থেকে যেন মুক্ত হই। এখনই তো দেশ গড়ার কিছু দায়িত্ব সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীদের হাতে অর্পণ করতে চাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে চৌষট্টি বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার বিষয় আমার মনে পড়ছে। ১৩১৪ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ দেশের যুব সমাজকে আহ্বান করে যে কথা বলেছিলেন তার চেয়ে বড় উৎসাহের কথা আমি জানি না। সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ঃ

"বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রতযক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগন সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ - সমস্তই আমাদের, এ - সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে আমরা নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ — এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে, ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ, এ আমাদেরই কীর্তি — যে দিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।"

২৪/৫/৭৪